উনিশ ও কুড়ি শতকের অসমিয়া সংবাদ-সাময়িকী : প্রেক্ষাপট কলকাতা

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত

আধুনিক ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় দুটি রাজ্য—অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ সুপ্রাচীন কাল থেকে পারস্পরিক আদান-প্রদানের অন্যতম ক্ষেত্র। সাম্প্রতিক অতীতে এই আঞ্চলিক সম্পর্কের খতিয়ান তুলে ধরার সার্বিক প্রয়াস আমাদের চোখে পড়ছে। যে সম্প্রীতির বাঁধন শতাব্দী প্রাচীন, যাকে নস্যাৎ করে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা স্বার্থান্বেষী মহল বহুবার করেছে, তা-যে চিরনবীন, তা বলা বাহুল্য। এর নিদর্শন খুঁজতে বসলে বর্তমান নিবন্ধের গতিপথ ভিন্নধারায় বইতে পারে। তবে একথা বলা আবশ্যক যে, ইংরেজের অধীনে দেশের রাজধানী এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার পত্তন, বিকাশ ও বিস্তারে প্রতিবেশী অঞ্চলের মানুষ আকর্ষিত হয়েছিলেন। বিশেষত, অসমবাসীর কাছে দশ হাজার মাইল দূরবর্তী দেশের ইংরেজ প্রভুর চেয়ে বঙ্গদেশের বিদ্বৎসমাজ অনেকটাই আপন। এর সঙ্গে জুড়তে হবে নবযুগের সঙ্গে তাল মেলানোর উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা—যেটা কালক্রমে প্রাদেশিক রাজনীতিকে উত্তপ্ত করলেও কলকাতার অগ্রগামিতাকে খর্ব করতে পারেনি। তাই অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনিশ শতকের সূচনা লগ্ন থেকে কলকাতার সঙ্গে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে উঠেছিল। অসমও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন যুগে যে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল গৌড়ে আর প্রাগজ্যোতিষপুরে—বঙ্গে আর কামরূপে, তারই যেন পুনর্ণবীকরণ ঘটল আধুনিক সময়ে, বিশেষত উনিশ শতকে। সংবাদ-সাময়িকপত্র হয়ে উঠল এর অন্যতম মাধ্যম।

'আসাম দেশীয় অতিমান্য লোকেরা বঙ্গদেশ এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত তাবদ্ব্যাপারের সঙ্গে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের দ্বারা সম্পর্ক রাখেন। ঐ আসাম দেশস্থেরা যাদৃশ এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র গ্রাহক, তাদৃশ প্রায় বঙ্গদেশের কোনো জিলায় দৃষ্ট হয় না।'—মন্তব্যটি ১৮৩১ সালে ৩০ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদকের।[১] কথাটা অবাক হওয়ার মতো হলেও অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অসমের অভিজাত এবং কিছু পরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ বঙ্গদেশ তথা কলকাতার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। অনেকেই হয়েছিলেন 'সমাচার-চন্দ্রিকা' আর 'সমাচার দর্পণ'-এর গ্রাহক। 'অতিমান্য' লোকেদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন। অসমের অভিজাত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মধ্যে বঙ্গদেশের পত্রিকা ছড়িয়ে দেবার বিষয়ে এঁর অবদান 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাও স্বীকার করেছিল—

'আসাম দেশের মধ্যে তিনিই প্রথম এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র গ্রাহক হইয়াছিলেন এবং অন্যের দিগকে তদ্বিষয়ে এমত প্রবোধ দিলেন যে এই ক্ষণে আসাম দেশে যত সম্বাদ পত্র চলিত হয় তত বঙ্গদেশের মধ্যে কোন জিলাতে চলে না।'[২]

শুধু গ্রাহক হওয়াই নয়। দুটো কাগজেই হলিরাম প্রবন্ধ, চিঠিপত্র লিখতেন। অসমে বাংলা ভাষা প্রচলনের আগেই তিনি এ-ভাষায় 'আসাম-বুরঞ্জী' বা অসমের ইতিহাস লিখেছিলেন। এঁর প্রায় সম-সাময়িক ছিলেন যাদুরাম ডেকাবরুয়া (১৮০১-৬৭), যজ্ঞরাম খারঘরীয়া ফুকন (১৮০৫-৩৮), মণিরাম দেওয়ান (১৮০৬-৫৮), কাশীনাথ তামুলি ফুকন (১৮০১-৮০), দীননাথ বেজবরুয়া

Scanned with OKEN Scanner

(১৮১৩-৯৫), হরকান্ত বরুয়া (১৮১৫-১৯০৩) প্রমুখ আরও অনেকে,যাঁরা অসমে বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রতিবাদ তো করেনইনি—উপরন্তু বাংলা সংবাদপত্রে লিখতে ভালোই বাসতেন। যজ্ঞরাম ফুকন প্রবন্ধ বা চিঠিপত্র লেখার বাইরে ইংরেজি কবিতার বাংলা অনুবাদও করতেন। তেমনই একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়।[৩]

মনে রাখতে হবে, অষ্টাদশ শতকের মোআমরীয়া বিদ্রোহ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের 'মান আক্রমণ' অর্থাৎ বর্মী আক্রমণ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল অসমিয়া ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির পথ দুর্গম করে তুলেছিল। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সাধনার পরিবেশও অনুকূল ছিল না। কিন্তু বঙ্গদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল সেই সময়েই। উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের ঢেউ অসমের মানুষকেও স্পর্শ করেছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনের সহযোগী বাঙালি আমলাবর্গের অসমে পদার্পণ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সম্ভবত এঁদের কাছে প্রাপ্ত কলকাতার কাগজগুলোই (সংবাদপত্র) অসমে বঙ্গীয় নবজাগরণের ধারণাকে স্পষ্ট করেছিল এবং সংযোগ গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছিল। উপরন্তু ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্যায়ে অভিজাত শ্রেণির অসমিয়া ভদ্রলোকেরা এ-কথা বুঝেছিলেন যে, প্রতিকূল পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে গেলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলাটা একান্ত প্রয়োজনীয়। কে না জানে অসমের কাছে বহির্বিশ্ব বলতে কলকাতাই ছিল সবচেয়ে নিকটবর্তী আকর্ষণ আর আগ্রহের কেন্দ্র। সংস্কৃতির এই প্রাণকেন্দ্র থেকে ছাপার অক্ষরে যে ভাবান্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল তা খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল অসমিয়া অভিজাত শ্রেণির কাছে। বহির্বিশ্বের কাছে নিজেদের চিন্তা-ভাবনাগুলোকে পৌঁছে দেবার জন্য তাঁরাও এই মাধ্যমটিকেই আশ্রয় করলেন। এ-সম্পর্কে তিলোত্তমা মিশ্র কী বলছেন তা একটু জেনে নেওয়া যাক,—

> "The fact that the Assamese writers chose to write in Bengali, a language that was not familiar to the Assamese people prior to the introduction of British rule, reveals the eagerness of these writers to forge links with the people in other parts of India."[8]

এর পরেই লেখিকার সিদ্ধান্ত, সংযোগ গড়ে তোলার জন্যই হলিরাম বাংলা ভাষায় লিখেছিলেন 'আসাম বুরঞ্জী' (১৮২৯)। সে যাই হোক, ডঃ মিশ্র আরও খানিকটা এগিয়ে বলছেন—

> "It is evident, therefore, that in the period immediately following the British annexation of Assam, there was an increasing awareness amongst Assamese intellectuals to come out of their age-old shells and to reach out to the rest of the world through the medium of the printed world."[৫]

আমাদের ধারণা, কলকাতা থেকে অসমিয়া সংবাদ সাময়িকী প্রকাশের প্রেক্ষাপট বা ভূমিকা নির্মাণ করেছে অসমিয়া বুদ্ধিজীবীদের উপরিউক্ত মনোভাব। প্রসঙ্গত বলি, কলকাতার সংবাদ জগতের সঙ্গে এঁদের এই যোগাযোগ প্রথম অসমিয়া সংবাদপত্র 'অরুণোদয়'-এর (১৮৪৬) প্রকাশের পরও অব্যাহত ছিল। চলছিল বাংলা ভাষায় লেখালেখি বা বইপত্র প্রকাশের ধারাও। এই সূত্রেই ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বা ব্রাহ্ম সংস্কার আন্দোলন অসমিয়া অভিজাত শ্রেণিকে আকৃষ্ট করেছিল। আধুনিক অসমিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির অগ্রজপ্রতিম গুণাভিরাম বরুয়া (১৮৩৭-৯৪) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন আবার বিধবা বিবাহও করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে 'অরুণোদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত

Scanned with OKEN Scanner

'রামনবমী' নাটক রচনার পেছনে গুণাভিরামের প্রেরণা ছিল উমেশচন্দ্র মিত্রর 'বিধবাবিবাহ' নাটক।[৬] আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের (১৮২৯-৫৯) দীর্ঘকালীন কলকাতা প্রবাস বাংলাভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে আগ্রহী করে তুলেছিল। আইন বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ ছাড়াও আনন্দরাম 'আইন ও ব্যবস্থাসংগ্রহ' (১৮৫৫) নামে একটি বিপুলায়তন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।[৭] এই দুজনের অন্যতম সহযোগী হেমচন্দ্র বরুয়ার (১৮৩৫-৯৬) বাংলা ভাষা ও বাঙালিপ্রীতি সর্বজনবিদিত। নিজের 'জীবন-চরিত'-এ একথা তিনি স্বীকার করেই গেছেন। এ-সমস্ত তথ্য ও ঘটনাবলি আমদের স্পষ্টভাবেই জানায় যে, বাংলাদেশের—বিশেষত কলকাতার ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি অসমিয়া অভিজাত শ্রেণির একটি আন্তরিক টান ছিল; যার ফলে পরবর্তীতে এখান থেকে পত্রিকা প্রকাশের কথা তাঁরা ভাবতে পেরেছিলেন। অসমে ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের প্রচেষ্টায় প্রেস স্থাপন (শিবসাগর, ১৮৩৬) হলেও বা সেখান থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগের বহু অসমিয়া বই প্রকাশিত হলেও[৮] এঁরা অসমিয়া পত্রিকা প্রকাশের আদর্শ স্থান হিসাবে সেদিন কলকাতা শহরের প্রেসকেই বেছে নিয়েছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি, গুণাভিরাম বরুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, দীননাথ শর্মা, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, হরনারায়ণ বরা, কৃষ্ণপ্রসাদ দুঅরা, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা প্রমুখ গুণী ব্যক্তিবর্গের জীবনের একটা পর্বে কলকাতা প্রবাসের ফলে। এই কলকাতা প্রবাস, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগের ইচ্ছা বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রভাব এবং ভাষাপ্রীতি —সবকিছুর মিশ্রিত ফল কলকাতা থেকে অসমিয়া পত্রিকার প্রকাশ।

উনিশ শতকে অসমিয়া অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির কলকাতা-প্রবাস সম্বন্ধে আরও একটি কথা এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে অসমে যখন আধুনিক শিক্ষার সূচনা হচ্ছে তখনই এই দুই শ্রেণির মানুষ কলকাতার পথে পা বাড়িয়েছিলেন। প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে অসমে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছিল টোল, পাঠশালা, সত্র, নামঘর এবং মক্তবকে আশ্রয় করে। অসমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম 'এজেন্ট' স্যার ডেভিড স্কট এসেই এখানে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। বিশেষ ভাবে নিম্ন অসমে বেশ কয়েকটি স্কুলও স্থাপন করা হয়েছিল। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ H.K. Barpujari আমাদের জানিয়েছেন, ১৮৩৫-এ গৌহাটি স্কুল স্থাপিত হয়, দ্বিতীয় সরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ১৮৪১ সালে শিবসাগরে।[৯] অসমে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা শুরু হয় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কটন মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। এর আগে হাতে গোনা কয়েকটি স্কুল আধুনিক শিক্ষা প্রসারের জন্য এগিয়ে এসেছিল আর এতে সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন পুরনো বিত্তবান উচ্চবর্ণ অভিজাত শ্রেণির ছেলে-মেয়েরাই। তাঁদেরই কয়েকজন উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন—কখনও স্বেচ্ছায় আবার কখনও ইংরেজ প্রভুদের ইচ্ছায়। জেনারেল জেনকিন্স এবং মেথি সাহেবের অনুপ্রেরণায় আনন্দরাম এবং দুর্গারাম ইংরেজি শেখার জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেন মেথি সাহেবেরই নৌকোয় চড়ে।[১০] আর লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ১৮৮৬-তে এন্ট্রান্স উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় গেলেন উচ্চশিক্ষার জন্য। এর আগে তাঁর দুই বড় দাদা গোবিন্দ বেজবরুয়া এবং গোলাপচন্দ্র বেজবরুয়া কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে অসমিয়া ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতাতেই যেতেন। লক্ষ্মীনাথের লেখাতে আমরা পাচ্ছি সে-কথা—

এইবাৰ মোৰ লগৰীয়া জনচেৰেক এন্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাত উঠি কলিকতাত পঢ়িবলৈ গ'ল।[১১]

অর্থাৎ 'এবার (১৮৫৫?) আমার (লক্ষ্মীনাথের) জনাচারেক বন্ধু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

Scanned with OKEN Scanner

হয়ে কলকাতায় পড়তে গেল।' এসব কথা এজন্য বলছি যে, প্রথম পর্বে অসমিয়া অভিজাত শ্রেণির কয়েকজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির পর দ্বিতীয় পর্বে বিত্তবান অসমিয়া মধ্যশ্রেণির অনেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় যেতেন। এই প্রবাস এবং কলকাতার সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ এঁদের মনে জাতীয় উন্নতির বাসনা জাগিয়ে তুলেছিল। আর সেই বাসনারই প্রকাশ ঘটেছিল পত্রিকার পাতায়। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব, এরকমই কয়েকজন প্রবাসী অসমিয়া একটি পত্রিকা প্রকাশ করে অসমিয়া সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করছেন।

এইসূত্রে অসমে সেকালের প্রকাশন-ব্যবস্থাকে একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে। শিবসাগরে ব্যাপটিস্ট মিশনারি নাথান ব্রাউনের প্রচেষ্টায় প্রেস স্থাপনের পর দীর্ঘদিন আর নতুন কোনও ছাপাখানা খোলার খবর পাওয়া যায় না। মাজুলির আউনিআটী সত্রে ধর্মপ্রকাশ যন্ত্রই অসমের দ্বিতীয় ছাপাখানা। এখান থেকে ১৮৭১-এ বেরিয়েছিল একটি অসমিয়া মাসিকপত্র 'আসাম বিলাসিনী'। এই ধর্মপ্রকাশ যন্ত্রের সঙ্গে কলকাতার একটা পরোক্ষ যোগাযোগ আছে কারণ আউনিআটী সত্রের সত্রাধিকার দত্ত দেবগোস্বামী মাধবচন্দ্র বরদলৈ এবং মানিকচন্দ্র বরুয়ার সহযোগিতায় কলকাতা থেকেই এটি এনেছিলেন। যাইহোক, ১৮৭২-এ তৎকালীন গৌহাটিতে শুরু হয় চিদানন্দ প্রেসের কাজ। চিদানন্দ দাসের (মতান্তরে চৌধুরী) সম্পাদনায় এ-বছরই প্রকাশিত

ক্রম	নাম	প্রকাশকাল	প্রকার	সম্পাদক	স্থিতিকাল
১.	আসাম দর্পণ	১৮৭৪	মাসিক	লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি	এক বছর। ১৮৭৫-এ এ পত্রিকা বন্ধ হয়।
২.	আসাম বন্ধু	১৮৮৫	"	গুণাভিরাম বরুয়া	প্রথম বছর ১২টি এবং দ্বিতীয় বছর দুটি যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে মোট ১৬টি সংখ্যা বেরিয়ে বন্ধ হয়ে যায়।
৩.	মৌ	১৮৮৬	"	হরনারায়ণ বরা	মাত্র চারটা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। ৭ মদন দত্ত লেনের ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে বি.সি. সরকার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।
৪.	জোনাকী	১৮৮৯	"	চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ও অন্যান্য	১৮৯৭ পর্যন্ত কলকাতায় এরপর ১৯০১-০৪ পর্যন্ত গুয়াহাটিতে
৫.	বিজুলী	১৮৯১	"	কৃষ্ণপ্রসাদ দুঅরা, বেণুধর রাজখোয়া ও অন্যান্য	১৪নং প্রতাপচন্দ্র চাটুর্জী লেন থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত প্রকাশিত। এরপর শিলং থেকে ১৯০২-০৩ পর্যন্ত প্রকাশিত।
৬.	দীপ্তি	১৯০৫	"	রেভাবেণ্ড এ.কে. গার্নি	অনিয়মিত ভাবে ১৯৪৫ পর্যন্ত।
৭.	বাঁহী	১৯০৯	"	লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ও অন্যান্য	আসাম বেঙ্গল স্টোর্স, ২নং লালবাজার স্ট্রিট থেকে কিছুটা অনিয়মিতভাবে ১৯৪৬ পর্যন্ত প্রকাশিত।

৮.	অকন	১৯১৬	মাসিক	হেমচন্দ্র গোস্বামী	বরপেটা নিবাসী লোহিত চন্দ্র ভূঞা প্রকাশিত শিশু পত্রিকা। প্রকাশ বন্ধ হয় ১৯১৯-এ।
৯.	আসাম হিতৈষী	১৯২৫	পাক্ষিক	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দুর্গাধর বরকটকী, মহাদেব শর্মা	আসাম হিতৈষী প্রেস, ৪৪ মানিকতলা স্ট্রিট থেকে সুকুমার মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করতেন। অনধিক চার বছর চলেছে।
১০.	অরুণ	১৯২৬	মাসিক	মহাদেব শর্মা	৮, সুবলচন্দ্র লেন থেকে প্রকাশিত এই শিশু পত্রিকা ১৯৩৪ পর্যন্ত চলেছিল।
১১.	আবাহন	১৯২৯	”	দীননাথ শর্মা	সামান্য বিচ্ছিন্নভাবে ১৯৭৬ পর্যন্ত।
১২.	পখিলা	১৯৩৩	”	হরেন্দ্রনাথ শর্মা	সচিত্র শিশু পত্রিকা, ১ বছর চলেছিল।
১৩.	পারিজাত	১৯৪১	”	দীননাথ শর্মা	৩, গোবিন্দ বোস লেন, ভবানীপুর থেকে প্রকাশিত সচিত্র শিশু পত্রিকা—চার বছর চলেছিল।
১৪.	দীপাবলী	১৯৫৩	”	তারকচন্দ্র শর্মা, অচ্যুত লহকর	৪, ফিরদৌস লেন, কল-১৪ থেকে প্রকাশিত। স্থিতিকাল অজ্ঞাত।
১৫.	আকাশী	১৯৫৯	পাক্ষিক	জি.সি. চক্রবর্তী, জি সুব্রহ্মণ্যন	১৯৮২ পর্যন্ত কলকাতায় এরপর গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।
১৬.	আমার প্রতিনিধি	১৯৬০	মাসিক	পদ্ম বরকটকী, ভূপেন হাজারিকা	প্রকাশক অরুণ পুরকায়স্থ ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন।
১৭.	পূর্বাকাশ	১৯৬০	”	সত্যেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী, কুশ দত্ত	স্থিতিকাল অজ্ঞাত।
১৮.	ভাইটিভনীটি	১৯৬৮	”	দেবযানী চলিহা	শিশু পত্রিকাটির স্থিতিকাল অজ্ঞাত।

হয় অসমের প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'আসাম মিহির'। ১৮৭৪-এ শ্রীহট্টকে প্রশাসনিক স্বার্থেই অসমের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল। আর ১৮৭৫ এই এখান থেকে কলকাতা প্রবাসী প্যারীচরণ দাসের সম্পাদনায় বেরিয়েছিল 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' পত্রিকা। 'বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস'-এ একথা স্পষ্ট নয় যে ১৮৭৫ এই শ্রীহট্টে প্রেস স্থাপিত হয়েছিল কি না। তবে এ-নিয়ে মতান্তর নেই যে 'শ্রীহট্টপ্রকাশ'ই শ্রীহট্টের প্রথম বাংলা এবং এতদঞ্চলের দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্র। অবশ্য ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দেই আখালিয়ার (শ্রীহট্ট) রেভারেন্ড জয়গোবিন্দ সোম 'Indian Christian Herald' নামে একটি পত্রিকা কলকাতা থেকেই ছেপে বার করেন।[১২] তার আগেই শিলচরের রামকুমার নন্দী মজুমদার

Scanned with OKEN Scanner

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রত্যুত্তরে লিখে ফেলেছেন 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য' (১৮৭২)। মনে রাখতে হবে শিলচরের প্রথম ছাপাখানা শিলচর প্রেস (১৮৮৫) তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতএব এ-বই ছাপা হবার সম্ভাবনা কলকাতাতেই। রামকুমারের 'গণিততত্ত্ব' বইখানাও (১৮৭৩) বেরিয়েছিল শ্রীরামপুর আলফ্রেড যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে। এ-ছাড়া ১৮৭৬-এ গোয়ালপাড়ায় শুরু হয় গোয়ালপাড়া হিতবিধায়িনী ছাপাখানার কাজ। এ-বছরই এখান থেকে বেরোয় এতদঞ্চলের তৃতীয় বাংলা পত্রিকা 'গোয়ালপাড়া হিতসাধনী'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকে অসমে যখন পত্রিকা প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে তখন ছাপাখানা বলতে ছিল মাত্র তিন-চারটি। মাঝেমধ্যে তাতে গ্রন্থ প্রকাশের কাজ চললেও অসমিয়া (এবং বাঙালি) বুদ্ধিজীবীরা পত্রিকা প্রকাশের জন্য কলকাতার ছাপাখানার উপরই নির্ভর করেছিলেন। 'অসমর সম্বাদ-পত্রর সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন' গ্রন্থ-প্রণেতা প্রসন্ন কুমার ফুকন বলছেন, '১৯৩০ সাল পর্যন্ত কলকাতা থেকে এগারটি পত্রিকার প্রকাশ লক্ষণীয়।'[১৩] আমরা জানি সংখ্যাটা আরও কিছু বেশি। পূর্বপৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট তালিকাটা দেখলেই সে-কথা বোঝা যাবে।

দেখা যাচ্ছে প্রায় একশ বছরের কালপর্যায়ে কলকাতা থেকে ১৮টি অসমিয়া পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। হয়ত আরও কিছু পত্র-পত্রিকার কথা অজানা থেকে গেছে। কিন্তু এই ১৮টি পত্রিকার প্রকাশও কম কথা নয়। এদের মধ্যে 'মৌ', 'জোনাকী', 'বাঁহী', 'আবাহন' তো অসমের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে যুগান্তকারী প্রভাব ফেলেছে।

একদিক থেকে দেখতে গেলে 'আসাম দর্পণ'ই কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। কলকাতার সঙ্গে অসমের সংবাদ জগতের সংযোগ এই পত্রিকাই ঘটিয়েছিল। কিন্তু মজার কথা হল শিবসাগর থেকে নাথান ব্রাউনেরা 'অরুণোদয়' নামে যে প্রথম অসমিয়া মাসিক পত্রিকাটি বার করেছিলেন, তার সঙ্গেও কলকাতার যোগাযোগ ছিল নিবিড়। পত্রিকাটির আদর্শ ছিল 'সমাচার দর্পণ'। এতে যে সব বিষয়বস্তু থাকত, তার সঙ্গে 'সমাচার দপর্ণের' বেশ মিল দেখা যায়। শুধু তাই নয়, 'অরুণোদয়' পত্রিকায় ১৮৫১ সালের মে সংখ্যায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গদেশ থেকে প্রকাশিত ২১টি সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণও প্রকাশিত হয়েছিল।[১৪]

যাইহোক, আমরা এখানে কয়েকটি পত্রিকার প্রকাশ বৈশিষ্ট্য এবং তৎসংলগ্ন কিছু তথ্যের অবতারণা করে বিষয়টির ইতি টানব। বিস্তৃত গবেষণায় হয়ত অজানা বহু কথা পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে। প্রথমে 'মৌ' পত্রিকাটির কথা বলা যাক। এটা সবাই জানেন যে, হরনারায়ণ বরা নামেই এর সম্পাদক ছিলেন, প্রবন্ধাদি লেখা এবং সম্পাদনার কাজ করতেন দাদা বলিনারায়ণ বরা। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার বলিনারায়ণের প্রিয় কবি ছিলেন Goldsmith। এই ইংরেজ কবির প্রিয় পত্রিকাটির নাম '*The Bee*' (১৭৫৯)। সম্ভবত এই গোল্ডস্মিথ প্রীতি তাঁকে নিজের পত্রিকার নামকরণে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর পত্রিকার পুরো নাম ছিল 'মৌ or the Bee'। এ-ধরনের নামকরণ,শুধু অসমে কেন অন্যান্য প্রাদেশিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও বিরল। এই পত্রিকার আরও একটি বিশেষত্ব হল বিষয়সূচির ওপরে ছাপা একটি উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছিল মধুসূদনের কবিতার থেকে—

রচ মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

সেকালের অসমিয়া বুদ্ধিজীবীদের মধুসূদন প্রীতির এ-এক অন্যতম নিদর্শন। প্রসঙ্গত বলি, এই বলিনারায়ণ বিবাহ করেছিলেন বঙ্গদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব রমেশচন্দ্র দত্তের মেজ মেয়ে বিমলা

Scanned with OKEN Scanner

খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি, মতান্তরে ৯ ফেব্রুয়ারি 'জোনাকী' আত্মপ্রকাশ করল। ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৮—এই দশ বছর কলকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। মোট ৬৯টা সংখ্যাই বেরিয়েছিল এবং শেষ হয় অষ্টম বছরে। কেউ কেউ বলেছেন যে, কিছুদিন বন্ধ থাকার পর এই পত্রিকা গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত হয় কনকলাল বরুয়া এবং সত্যনাথ বরার সম্পাদনায়। সময়কাল ১৯০১ থেকে ১৯০৪। 'জোনাকী'র আট বছরের প্রকাশ পর্বে মোট পাঁচজন সম্পাদক কাজ করেছেন। এঁরা হলেন চন্দ্রকুমার গুপ্ত, হেমচন্দ্র গোস্বামী, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, কনকলাল বরুয়া এবং রমাকান্ত বরকাকতি। পত্রিকার ৭ম এবং ৮ম ভাগ কলকাতার কোন প্রেসে ছাপা হয়েছিল জানা যায় না। ১ম থেকে ৬ষ্ঠ ভাগ পর্যন্ত ৬টি আলাদা আলাদা প্রেসে এই পত্রিকা ছাপা হবার খবর পাওয়া যায়। রামনারায়ণ যন্ত্র, ৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিট থেকে রাধারমণ প্রেস, ১২২ নং আমহার্স্ট স্ট্রিট পর্যন্ত তার বিস্তার। এই পত্রিকার কিছু বাঙালি গ্রাহকও ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অসমিয়া ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির আধুনিক সাধনার দ্বারা অসমিয়া জাতিকে সমৃদ্ধ করাই ছিল 'জোনিকী'র লক্ষ্য। এর কোনও রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না। অসমিয়া কবিতার নতুন ধারা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 'জোনাকী' অসমিয়া ছোটগল্পের ধারারও সূচনা করে। বিশেষভাবে লক্ষ্মীনাথ বেজরুয়ার হাতে অসমিয়া সাহিত্যের প্রায় সব নতুন ধারাই 'জোনাকী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। 'জোনাকী'তে পদ্য, প্রবন্ধ, নাটক, জীবনী, ছোটগল্প, উপন্যাস, ঐতিহাসিক আখ্যান, ভ্রমণ কাহিনি, ব্যঙ্গ রচনা, পুঁথি সমালোচনা ইত্যাদি সবই প্রকাশিত হত।

'জোনাকী'-র দ্বিতীয় ভাগের (বছরের) একাদশ সংখ্যায় বেরিয়েছিল বেণুধর রাজখোয়ার রঙ্গ নাটক 'ডেকা-গাভরু'। হাস্যরস সৃষ্টির জন্য তিনি কয়েকটি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছিলেন যার কঠোর সমালোচনা হয় 'জোনাকী'-তেই। এটা অ.ভা.উ.সা সভার কয়েকজন সদস্যকে আঘাত করে। ফলে ৬৭ নং মির্জাপুর স্ট্রিটের মেস থেকে তাঁরা চলে আসেন ১৪নং প্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জী স্ট্রিটের মেসে। আর এই মনোমালিন্যের ফসল 'বিজুলী' পত্রিকা। এটা প্রকাশিত হত ৬৮ নং বলরাম দেব স্ট্রিটের কৃপাসিন্ধু (বা কৃপানন্দ যন্ত্র) প্রেস থেকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে 'জোনাকী' অসমিয়া সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনকে একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছিল। আর এই ধারাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সম্পাদিত 'বাঁহী'। এই পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী বলেছেন, ১৯০৯ সালের আগস্ট মাসে মির্জাপুর স্ট্রিটের 'নায়েক জুবিলি ইনস্টিট্যুশন' নামে একটি ঘরে কলকাতা-প্রবাসী কয়েকজন অসমিয়া ছাত্র এবং দু-চারজন ভদ্রলোক মিলিত হয়েছিলেন বহুদিন নিষ্ক্রিয় 'এ.এস.এল ক্লাব' বা অসমীয়া ছাত্রদের সাহিত্য সভাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে। এখানেই আবার একটি সংবাদপত্র প্রকাশের কথা ভাবা হয়। ভোলানাথ কাকতি, যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী, নীলমণি ফুকন, রোহিণীকুমার চৌধুরী এবং পূর্ণানন্দ পাঠক হেয়ার স্ট্রিটে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে যান। লক্ষ্মীনাথ তাঁদের বলেন তিনমাসের জন্য অন্তত ১৮টি প্রবন্ধ লিখে দিতে হবে। এঁরা সে কথা রেখেছিলেন। ফলে সেই বছরই অঘ্রাণ মাসে বেরোল 'বাঁহী'-র প্রথম সংখ্যা।[১৮] 'বাঁহী' ১৯৩১ পর্যন্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ডিব্রুগড় থেকে অমিয় কুমার দাসের সম্পাদনায় তিন বছর এবং শেষে মাধব বেজবরুয়া ও মুণীন বরকটকীর সম্পাদনায় গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। মাঝে এক বছরের কিছু বেশি সময় (১৯২৬-২৭) এর প্রকাশ বন্ধ ছিল। শেষ পর্যায়ে পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হয়ে গিয়েছিল। যাইহোক,

Scanned with OKEN Scanner

সম্বলপুরে ব্যবসার কাজ চালাতে চালাতে লক্ষ্মীনাথ যতদিন পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন ততদিন তাঁর লক্ষ্য ছিল অসমিয়া ভাষা সাহিত্যের উন্নতিসাধন। ছোটগল্প, প্রাচীন অসমিয়া সাহিত্যের আলোচনা, প্রবন্ধ, নতুন কবিতা, সমসাময়িক ভাষা-সাহিত্য এবং সামাজিক সমস্যার আলোচনা এই কাগজের প্রধান অবলম্বন ছিল। আর একটি কথা বলে আমরা 'বাঁহী'র প্রসঙ্গ শেষ করব। 'বাঁহী'র তৃতীয় সংখ্যায় বংশীবাদনরতা এক মহিলার ছবি ছাপা হয়েছিল। এটা দেখে শ্রীশ্রী আউনিআটির গোস্বামীদেব বেশ কৌতুক অনুভব করেছিলেন এবং 'নির্ম্মালী' শিরোনামে একটি কবিতাও লিখে পাঠিয়েছিলেন। তাতে মূল বক্তব্য ছিল যে, পাঠক হিসাবে গোস্বামীদেব কখনও রাধার বাঁশী বাজানো শোনেননি—সেটা কেমন তা যদি শ্রী বেজবরুয়া বলে দেন তাহলে ভালো হয়। লক্ষ্মীনাথ কবিতাটা ৮ম সংখ্যায় ছেপেছিলেন এবং গোস্বামীদেবকে সম্মান জানিয়ে ছবিটা 'বাঁহী'র পাতা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।[১৯]

কুড়ি শতকের অসমিয়া সাহিত্যের অন্যতম যুগ প্রবর্তক পত্রিকা 'আবাহন'। লক্ষ্মীপুরের জমিদার নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং তাঁর বন্ধু দীননাথ শর্মার যুগ্ম প্রচেষ্টায় এর জন্ম হয়। প্রায় দেড় দশক ধরে পত্রিকাটি অসমের জনজীবনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অসমে সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ বিভাগ হয়েছে পত্রিকাকে অবলম্বন করে (যেমন বঙ্গদেশে কল্লোলযুগ)। এই 'আবাহন যুগ'টা অসমিয়া সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হিসাবে চিহ্নিত।

১৯৩৬ সালে সম্পাদক দীননাথ শর্মা নিজে একটা ছাপাখানা খোলেন এবং সেখান থেকেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ১৯৫৩ পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। অবশ্য প্রথম সংখ্যাটি ছাপা হয়েছিল ৪২ নং বাদুড় বাগান স্ট্রিটের কামরূপ প্রেসে। এরপর এই পত্রিকা ছাপার কাজ চলে ক্রমান্বয়ে ১৪ নং জগন্নাথ দত্ত লেনের লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং মনোহর পুকুর রোডের আবাহন আর্ট প্রিন্টার্স-এ। এই প্রেসগুলো সম্পর্কে যদি কোনও তথ্য পাওয়া যায়, তবে সেই সময়কার অসম-বঙ্গ সম্পর্ক নিয়ে আরও অজানা কথা বেরিয়ে আসার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের সমস্ত কৃতী সাহিত্যিকই এই পত্রিকায় লিখেছেন। প্রকাশের বছরই এর গ্রাহক সংখ্যা ছিল ২০০০।[২০] এই পত্রিকার আদর্শ ছিল 'মাসিক বসুমতী', 'ভারতবর্ষ' এবং 'প্রবাসী'। সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে সুদৃশ্য ছবি, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতাসহ আবাহন' প্রকাশ পেতে শুরু করে। এর স্বাধীনচেতা আদর্শ নবীনচন্দ্র বরদলৈ, তরুণরাম ফুকন, গোপীনাথ বরদলৈ প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আকর্ষণ করেছিল। এই 'আবাহন যুগেরই অন্যতম স্রষ্টা কবি গণেশ গগৈ এবং দেবকান্ত বরুয়া। এখানেই অসমিয়া ছোটগল্পের পরিণতি লাভ-নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী, রমা দাস, চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানী প্রভৃতির হাতে এই সমৃদ্ধি লাভ করেছে অসমিয়া সাহিত্য। তাছাড়া ভাষার শুদ্ধতার দিকেও এই পত্রিকার নজর ছিল তীক্ষ্ণ।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি অসমিয়া সংবাদ সাময়িকীর প্রকাশক বা স্বত্ত্বাধিকারীরা ছিলেন বাঙালি। যেমন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'আসাম হিতৈষী'। এর স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সুকুমার মুখোপাধ্যায় (পরমানন্দ মজুমদার এঁকে উল্লেখ করেছেন কুমার দেব মুখোপাধ্যায় হিসাবে)।[২১] পত্রিকাটির সম্পাদক হিসাবে একবছর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য কাজ করেছিলেন। দায়িত্ব ছেড়ে দেবার কারণ ছিল স্বত্ত্বাধিকারীর সঙ্গে মনোমালিন্য। এই সম্পর্কে হেমচন্দ্র গোস্বামীকে লেখা একটি চিঠিতে শ্রীভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন—

আসাম হিতৈষীখন এৰিলোঁ কাৰণ অসমীয়া মানুহৰ পৰা ধন আনি বংগালীক খাবলৈ দিয়া হয়।[২২]

Scanned with OKEN Scanner

অর্থাৎ 'আসাম হিতৈষী ছাড়লাম, কারণ এখানে অসমিয়াদের কাছ থেকে টাকা এনে বাঙালিদের খেতে দেওয়া হয়।'

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এ-ধরনের বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে আছে উনিশ-কুড়ি শতকে কলকাতা থেকে অসমিয়া সংবাদ-সাময়িকী প্রকাশের পর্বটি।

এটা ইতিহাস। এই ঐতিহাসিক পর্বের একটা অন্তর্লীন প্রবণতা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেই আমরা আলোচনায় ইতি টানব। আমরা অসমিয়া অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির কলকাতা থেকে পত্রিকা প্রকাশের আগ্রহ ও তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি বঙ্গের কিছু মানুষ, বঙ্গের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অবস্থান এঁদের প্রভাবিত করেছে। একই সঙ্গে স্বজাতি ও ভাষা সম্পর্কে আত্মাভিমানও এঁদের জেগে উঠেছে। পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে কোনও কোনও বাঙালি এবং বাংলা ভাষার আধিপত্যের ওপর খেদ। 'জোনাকী', 'বিজুলী', 'বাঁহী', 'আবাহন'-এ সচেতন ভাবে 'বঙলুরা' (বাঙালি) ছাঁদ বর্জন করা হয়েছে এবং এ-সম্পর্কে প্রবন্ধাদিও লেখা হয়েছে। অথচ 'আসাম বন্ধু' বা 'মৌ'-তে বাংলা ভাষাছাঁদকে একেবারে অগ্রাহ্য করা হয়নি। এই প্রবণতাকে কি আমরা Bengalisation থেকে De-Bengalisation-এর দিকে যাত্রা হিসাবে দেখতে পারি? যদি সেটা হয় তবে তা উনিশ ও কুড়ি শতকে অসমে নয়, কলকাতার বুকেই শুরু হয়েছিল পত্রিকা প্রকাশের সূত্রে।

ঋণস্বীকার ঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য, বৈকুণ্ঠ রাজবংশী, গ্রন্থাগারিক প্রাগজ্যোতিষ কলেজ।

টীকা ও উৎস নির্দেশ ঃ

১। অমলেন্দু গুহ, 'অসমৰ ওপৰত বঙ্গৰ নবজাগৰণৰ প্ৰভাৱ', সাম্প্ৰতিক সাময়িকী, গুহায়াটি, ১৯৭৬, পৃ. ৬২।

২। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, 'আসাম বুৰঞ্জী', '*সম্পাদকের নিবেদন*', মোক্ষদা পুস্তকালয়, গুয়াহাটি, ১৩৬৯ (বাং), পৃ. ০.৩৪।

৩। প্রফুল্ল মহন্ত, 'অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ইতিহাস', ভবানী সংস্করণ, গুয়াহাটি, ২০১০, পৃ. ১৮৩।

৪। তিলোত্তমা মিশ্র, 'Literature and Society in Assam', ভবানী সংস্করণ, গুয়াহাটি ২০১০, পৃ. ৫৭।

৫। তদেব, পৃ. ৫৭।

৬। সুকুমার সেন, 'History of Bengali Literature', সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী, ১৯৬০, পৃ. ১৮০।

৭। অমলেন্দু গুহ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৩।

৮। বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া, 'History of Assamese Literature', সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৮, পৃ. ১০৭। ড. সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে, আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রকাশিত ৪৩টি অসমিয়া এবং ৫টি ইংরেজি পুঁথির তালিকা তৈরি করেছেন তিনি এবং এর ৩/৪ অংশ বই লেখক দেখেছেন। (সূত্র ঃ 'অৰুণোদইৰ আৰ্হিৰূপে বংগীয় কাকত', অসমৰ বাতৰিকাকত-আলোচনীৰ ডেৰশ বছৰীয়া ইতিহাস, গুয়াহাটি, ১৯৯৮, পৃ. ১৩১)।

৯। হেরম্বকান্ত বরপূজারি, 'A Short History of Higher Education in Assam (1829-1900)', Golden Jubilee Volume, Cotton College, Guwahati, 1952, pp. 7-8.

Scanned with OKEN Scanner

১০। মহেশ্বৰ নেওগ, 'আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ অসমিয়া ভাষা', যোরহাট, ১৯৬৮, পৃ. ১১।

১১। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, 'মোৰ জীবন সোঁৱৰণ', বনলতা প্রকাশন, সুলভ সংস্করণ, ডিব্রুগড়, মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ৭০।

১২। উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, *'সুরমা উপত্যকায় সাংবাদিকতার বিকাশ পর্বের পটভূমি'*, 'নবপর্যায় সম্ভার', শিলচর, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৬৬।

১৩। প্রসন্নকুমার ফুকন, 'অসমৰ সংবাদপত্রৰ সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন', মধুপ্রকাশ, দেরগাঁও (অসম), ১৯৯৬, পৃ. ১৬।

১৪। সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *'অৰুণোদইৰ আৰ্হিৰূপে বংগীয় কাকত'*, 'অসমৰ বাতৰিকাকত-আলোচনীৰ ডেৰশ বছৰীয়া ইতিহাস', গুয়াহাটি, মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ১৩০-১৩১।

১৫। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭৮।

১৬। এই চন্দ্রকুমার গুপ্ত বেশ কিছু কবিতা 'জোনাকী'তে লিখেছেন। এর মধ্যে নাম কবিতা 'জোনাকী' এবং 'বনকুঁৱৰী' অন্যতম। দ্র. নগেন শইকিয়া (সম্পা), 'জোনাকী', অসম সাহিত্য সভা, গুয়াহাটি, ২০০১, পৃ. ০২০।

১৭। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭৯।

১৮। যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী, 'সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুয়া', গুয়াহাটি, ১৯৬৮, পৃ. ১৮৩।

১৯। ড. নমিতা ডেকা, *'অসমীয়া ভাষা-সাহিতলৈ বাঁহীৰ অৱদান ঃ সম্পাদক বেজবৰুৱাৰ কৃতিত্ব'*, পূর্বোক্ত 'অসমৰ বাতৰিকাকত আলোচনীৰ ডেৰশ বছৰীয়া ইতিহাস' গ্রন্থ, পৃ. ২১৩।

২০। প্রসন্নকুমার ফুকন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৩-৫৪।

২১। চন্দ্রপ্রসাদ শইকিয়া (সম্পা) 'অসমৰ বাতৰিকাকত-আলোচনীৰ ডেৰশ বছৰীয়া ইতিহাস', গুয়াহাটি, ১৯৯৮, পৃ. ১৯১।

২২। তদেব, পৃ. ১৯৩।

Scanned with OKEN Scanner